জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি ... ২
হেপাটাইটিস ... ৩
টাকী মাছের বহু গুণ ... ৫
রোগ ... ৬

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৩ সংখ্যা ২ শ্রাবণ ১৪০১

ভাইরাস জ্বর

সংলাপ রিপোর্ট

ঢাকা মহানগরীসহ দেশের প্রায় প্রতিটি ঘরে মহামারীর আকারে ভাইরাস জ্বর শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ ভাইরাসের কোন চিকিৎসা নেই। শুধুমাত্র উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করলে এমনিতেই ৬/৭ দিনের মধ্যে জ্বর ভাল হয়ে যায়। অথচ ভাইরাস জ্বরের চিকিৎসায় জীবাণুনাশক বা এন্টিবায়োটিকসের অপব্যবহার হচ্ছে উদ্বেগজনকভাবে। সাধারণ চিকিৎসক থেকে শুরু করে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ পর্যন্ত ভাইরাস জ্বরের চিকিৎসায় এন্টিবায়োটিকস সেবনের ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন।

ভাইরাস জ্বরের লক্ষণসমূহ

জ্বরে আক্রান্ত রোগীর শরীরের তাপমাত্রা ৯৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট থেকে ১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠতে পারে। জ্বরের সাথে সর্দি-কাশি থাকতে পারে এবং শরীর অস্বাভাবিক দুর্বল হয়ে পড়ে। সারা শরীরে, মাথায় প্রচন্ড ব্যথা হয়। জ্বর বেশী হলে বমি হতে পারে। খাবারে অরুচি হয়।

চিকিৎসা

পূর্বেই বলা হয়েছে আমাদের দেশে ভাইরাসের কোন চিকিৎসা এখনও নেই। শুধুমাত্র উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। জ্বর নিরাময়ে প্যারাসিটামলজাতীয় ওষুধ সেবন ফলদায়ক। যাদের বয়স ১২ বছরের উপরে, তাদের ক্ষেত্রে প্যারাসিটামল অথবা ডিসপ্রিন ট্যাবলেট ১টা করে দিনে ৩ বার সেবন করা যেতে পারে। একজন পূর্ণবয়স্ক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি দৈনিক ৬টা পর্যন্ত ট্যাবলেট সেবন করতে পারবেন। তবে ডিসপ্রিন কখনও 'খালি' পেটে খাওয়া উচিত নয়। পেটে ব্যাথা থাকলে, ডিসপ্রিন সেবনের পর দুধ অথবা এন্টাসিড সেবন করা উচিত। যেসব রোগীদের বয়স ১২ বছরের কম তাদের শুধুমাত্র প্যারাসিটামল সেবন করা উচিত। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে কোন ভাল ঔষধ কোম্পানীর প্যারাসিটামল সিরাপ সেবন বাঞ্ছনীয়। ছোট শিশুদের বয়স অনুযায়ী সিরাপ খাওয়াতে হবে। জ্বরের মাত্রা বেড়ে গেলে ($\geq$১০১° ফারেনহাইট) রোগীকে সামান্য কিছু খাওয়ানোর পর প্যারাসিটামল সেবন করাতে হবে এবং পাশাপাশি মাথায় ঠান্ডা পানির ধারা ও সারা শরীর কোল্ড স্পঞ্জ (কলের পানি দিয়ে শরীর মোছানো) করতে হবে।

এছাড়া জ্বরের সাথে সর্দি-কাশি থাকলে এন্টিহিসটামিন অথবা ডেকসট্রোমেথরফ্যানজাতীয় ওষুধ সেবন করা যেতে পারে। কাশি নিরাময়ে গরম পানি গড়গড়া করলেই ভাল ফল পাওয়া যায়। জ্বরের সাথে বমি হলে খাওয়ার পরে বমি নিবারক ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। জ্বর-সর্দি ৬/৭ দিনের মধ্যে যদি না কমে তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওষুধ সেবন করতে হবে। জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের খাবার ব্যাপারে তেমন কোন বাঁধা-নিষেধ নেই। রোগীকে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক খাবার দিতে হবে। তবে এসব জ্বরের ক্ষেত্রে আনারস, আম, লেবু ইত্যাদি বেশ উপকারী। এছাড়া প্রচুর পানি, শরবত ও তরল খাবার যেকোন জ্বরের সময়ই উপকারী।

জটিলতা

ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত রোগীর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে

যেতে পারে, বিশেষ করে পুষ্টিহীন শিশুদের ক্ষেত্রে। এ সময় রোগী অন্যান্য রোগজীবাণু দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হতে পারে। বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করলে টায়ফয়েড, নিউমোনিয়া ও শ্বাসনালীর অন্যান্য রোগে ভুগতে পারে। যেকোন ধরনের জটিলতা সন্দেহ হলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

রোগ প্রতিরোধের উপায়

ভাইরাস জ্বর একটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। বাড়িতে একজন আক্রান্ত হলে অন্যদেরও হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রোগীর হাঁচি-কাশি ও বাতাসের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। আক্রান্ত রোগীর মুখে রুমাল বা অন্য কোন পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে অন্যদের সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। আর তা সম্ভব না হলে আক্রান্ত রোগীকে কয়েকদিন পৃথক রাখা বাঞ্ছনীয়। এসব নিয়ম মেনে চললে ভাইরাস জ্বর অনেকটা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

কনডম

জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি

মোঃ মাহবুব উল আলম

বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের শুরু থেকেই পুরুষদের জন্য কনডম একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সম্প্রতি উন্নত বিশ্বে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের ব্যবহারোপযোগী কনডম বাজারজাত করা হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য এটি একটি কার্যকর ও নিরাপদ অস্থায়ী পদ্ধতি। সারা বিশ্বে প্রায় ৪৬০ লক্ষ দম্পতি কনডম ব্যবহার করেন। কনডমই একমাত্র জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি যা অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভসঞ্চার রোধের পাশাপাশি যৌন রোগ সংক্রমণ (STD) থেকে রক্ষা করতে পারে। কনডম ব্যবহার করলে এইডস-এর মত ভয়াবহ কালব্যাধি থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।

কনডম কি?

কনডম লেটেক্স রাবারের তৈরী এক ধরনের আবরণ যা সহবাসের ঠিক পূর্বমুহূর্তে পুরুষের যৌনাঙ্গে পরে নিতে হয়। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন উন্নত দেশে রাবারের পাশাপাশি প্লাষ্টিকের তৈরী কনডম বাজারজাত করা হচ্ছে। তবে আমাদের দেশে শুধুমাত্র রাবারের তৈরী কনডম ব্যবহৃত হচ্ছে। পুরুষ যৌনাঙ্গে এই আবরণ থাকার ফলে কনডমের ভিতরে বীর্য জমা হয় এবং শুক্রকীট (sperm) জরায়ুতে প্রবেশ করতে পারে না।

কনডমের কার্যকারিতা

জন্মনিয়ন্ত্রণে কনডম খুবই কার্যকর পদ্ধতি। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এর কার্যকারিতার হার শতকরা ৪২ থেকে ৯৮ ভাগ। কনডম ব্যবহারের পাশাপাশি স্ত্রী যৌনাঙ্গে ব্যবহারযোগ্য শুক্রকীট ধ্বংসকারী জন্মনিরোধক (যেমন ফেনা বড়ি, এমকো, ফোম ইত্যাদি) ব্যবহার করলে কনডমের কার্যকারিতার হার আরও বাড়ানো সম্ভব।

কারা কনডম ব্যবহার করতে পারেন

* যেকোন সক্ষম দম্পতি জন্মনিরোধের জন্য কনডম ব্যবহার করতে পারেন। তবে যেসব মহিলা বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তাঁদের জন্য কনডম একটি আদর্শ পদ্ধতি। কারণ এ পদ্ধতি বুকের দুধের পরিমাণ বা গুণাগুণের উপর কোন বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে না।
* স্বামী/স্ত্রী চাকুরী বা অন্য কোন কারণে দু'জন দু'জায়গায় থাকেন এবং মাঝেমধ্যে সহবাসে মিলিত হন এবং যদি স্ত্রী অন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার না করে থাকেন তবে তাঁদের কনডম ব্যবহার করা উচিত।
* যেসব দম্পতি অন্য কোন পদ্ধতি নেয়ার কথা ভাবছেন অথচ এখনও মনস্থির করেননি তাঁদের বেলায় জন্মনিরোধের জন্য আপাততঃ কনডম ব্যবহার করা উচিত।

যেসব ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে কনডম ব্যবহার করা উচিত

* যাঁদের লেটেক্স অর্থাৎ কৃত্রিম রাবার ব্যবহারে এলার্জি আছে তাঁদের বেলায় হয়তোবা চুলকানি হতে পারে।
* যেসব দম্পতি আর একটিও সন্তান চান না তাঁদের বেলায় কনডম ব্যবহারের পরিবর্তে অধিক কার্যকর পদ্ধতি (যেমন বন্ধ্যাকরণ, আই.ইউ.ডি, ইনজেকশন ইত্যাদি) বেছে নেয়া উচিত।

কনডম ব্যবহারের সুবিধা

— ব্যবহার করা খুবই সহজ।

— সহজে পাওয়া যায়।

— দাম কম।

— পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে।

— সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এর কার্যকারিতার হার ভাল।
— যৌন সংসর্গের মাধ্যমে যেসব রোগ ছড়ায় তা প্রতিরোধে খুবই কার্যকর।
— জন্মনিয়ন্ত্রণে স্বামীকে সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালনে সুযোগ দেয়।

কনডম ব্যবহারের অসুবিধা

— সহবাসের সময় কনডম ফেটে যেতে পারে অথবা স্থানচ্যুত হওয়ার ফলে যৌনক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
— রাবার ব্যবহারে যাঁদের এলার্জি আছে তাদের কখনও কখনও চুলকানি হতে পারে।

কনডম কখন এবং কিভাবে ব্যবহার করতে হবে

কনডম ব্যবহার খুবই সহজ, তবে সঠিক নিয়মে কনডম ব্যবহার না করলে সহবাসের সময় কনডম ফেটে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভসঞ্চার হতে পারে। তাই কনডম ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কনডম ব্যবহারের পূর্বে দেখতে হবে কনডম নিশ্ছিদ্র কিনা।

— মিলনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে পুরুষাঙ্গে কনডম পরতে হবে।
— পুরুষাঙ্গে কনডম পরার সময় অথবা যৌনক্রিয়ার সময় কনডম ফেটে গেলে নতুন আরেকটি কনডম পরে নিতে হবে।
— প্রতিবার যৌনক্রিয়ার সময় একটি নতুন কনডম ব্যবহার করতে হবে। কোন অবস্থায়ই ব্যবহৃত কনডম পুনঃব্যবহার করা যাবে না।

পরিপূরক পদ্ধতি হিসেবে কনডমের ব্যবহার

কোন দম্পতি একটি পদ্ধতি ব্যবহারকালীন সময় নিম্নলিখিত অবস্থার উদ্ভব হলে পরিপূরক পদ্ধতি হিসেবে কনডম ব্যবহার করতে পারেন :

* সন্তান জন্মের ৬ সপ্তাহ পার হয়েছে, মা তাঁর বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এবং ক্লিনিক্যাল কোন্ পদ্ধতি নিবেন তা এখনও স্থির করতে পারেননি এ অবস্থায় তিনি পুনরায় গর্ভসঞ্চার রোধে আপাততঃ কনডম ব্যবহার করতে পারেন।

* যেসব মহিলা খাবার বড়ি, ইনজেকশন, আই.ইউ.ডি অথবা বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি নিতে আগ্রহী অথচ মাসিক আরম্ভ হতে দেরী আছে তাঁদের মাসিক আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত আপাততঃ কনডম ব্যবহার করা উচিত।

* খাবার বড়ি খাচ্ছেন এমন কোন মহিলা যদি পর পর দু'দিন ২টি বড়ি খেতে ভুলে যান, তাহলে যখনই মনে পড়বে তখনই ২টি বড়ি খাবেন। তার পরদিনও ২টি বড়ি খাবেন। বাকী বড়িগুলো স্বাভাবিক নিয়মে খাওয়ার পাশাপাশি পরবর্তী ৭ দিন কনডম ব্যবহার করবেন।

* আই.ইউ.ডি গ্রহণকারী কোন মহিলা যদি আই.ইউ.ডি-এর সুতা খুঁজে না পান এবং মহিলার যদি ধারণা জন্মে যে আই.ইউ.ডি আপনা-আপনি পড়ে গিয়েছে তাহলে নিকটস্থ ক্লিনিকে গিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে আই.ইউ.ডি-এর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। এক্ষেত্রে ক্লিনিকে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভসঞ্চার রোধে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের জন্য আপাততঃ কনডম ব্যবহার করা উচিত।

* পুরুষ বন্ধ্যাকরণ করার পর অন্ততঃ ১৫ বার যৌনমিলনের সময় কনডম ব্যবহার করা উচিত।

* মাসিক চক্রের মাঝামাঝি সময়ে যদি মহিলার বন্ধ্যাকরণ করা হয় সেক্ষেত্রে পরবর্তী মাসিক না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর কনডম ব্যবহার করা উচিত।

* পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি ব্যবহার করছেন এমন একটি দম্পতি যদি যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে এমন রোগ থেকে একে অপরকে রক্ষা করতে চান সেক্ষেত্রে কনডম ব্যবহার করা উচিত।

কোন্ কোন্ উৎস থেকে কনডম পাওয়া যায়

একজন আগ্রহী গ্রহীতা খুব সহজেই কনডম সংগ্রহ করতে পারেন। বাংলাদেশ সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে মাঠকর্মীগণ (FWA) ক্লায়েন্টের দোরগোড়ায় পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন সেবা পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি নামমাত্র মূল্যে (প্রতি ডজন ৫০ পয়সা) কনডম সরবরাহ করে থাকেন। এছাড়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র অথবা সরকারী হাসপাতাল থেকেও নামমাত্র মূল্যে কনডম সরবরাহ করা হয়। সরকারী কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরাও কনডম বিতরণ করে থাকেন। এছাড়া বাণিজ্যিক ভিত্তিতেও আমাদের দেশে কনডম বাজারজাত করা হয়েছে। নিকটস্থ দোকান, হাট-বাজার অথবা যেকোন ওষুধের দোকান থেকেও স্বল্পমূল্যে কনডম কিনে ব্যবহার করা যায়।

কিভাবে কনডম সংরক্ষণ করতে হয়

মনে রাখবেন, অতিরিক্ত তাপ ও আলোর প্রভাবে কনডমের রাবার নরম হয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে। তাই ঠাণ্ডা, শুকনো ও অন্ধকার জায়গায় কনডম সংরক্ষণ করা উচিত। তিন বৎসর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে সেই কনডম ব্যবহার করা ঠিক নয়।

ভাইরাল হেপাটাইটিস

ডা: মোড়ল নজরুল ইসলাম

সাধারণের কাছে জন্ডিস নামে পরিচিত হেপাটাইটিস হচ্ছে দেহের সর্ববৃহৎ রাসায়নিক কারখানা লিভার বা যকৃতের প্রদাহজনিত রোগ। বাংলাদেশে বর্তমানে হেপাটাইটিস একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা। দেশের লিভার বিশেষজ্ঞগণের মতে প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের শতকরা ৯০ ভাগ বা তার অধিক লোক জীবনের কোন না কোন সময় হেপাটাইটিস 'এ' ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হন। ইংরেজী বর্ণমালার 'A' থেকে 'G' পর্যন্ত অর্থাৎ হেপাটাইটিস A, B,C, D, E, F, G দ্বারা ভাইরাস পরিবারের নামকরণ করা হয়েছে। সচরাচর মহামারীর আকারে শহরে ও গ্রামে-গঞ্জে জন্ডিসের যে প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তার সংক্রমণের কারণ হলো হেপাটাইটিস "এ" ও "ই" ভাইরাস (Hepatitis A & E

virus)। এ দু'টি আর এন এ (RNA)-সংযোজিত ক্ষুদ্র ভাইরাস।

হেপাটাইটিস সংক্রমণের কারণ

হেপাটাইটিস একটি সংক্রামক ব্যাধি। সাধারণত: সংক্রমিত পানি কিংবা খাবারের মাধ্যমে হেপাটাইটিস 'এ' ও হেপাটাইটিস 'ই' রোগ ছড়ায়। পরিবারের কেউ এ রোগে আক্রান্ত হলে পরিবারের অন্য সদস্য, নিকটতম আত্মীয়, রোগীর সাহচর্য ও পরিচর্যার কাজে নিয়োজিতদের মধ্যে এই ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে।

হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাস পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। 'বি' ভাইরাসের সংক্রমণ প্রায় এইডস ভাইরাস সংক্রমণের মতই। হেপাটাইটিস 'বি' হতে লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ। অপরিষ্কার, দূষিত ও জীবাণু সংক্রমিত ইনজেকশনের সুঁচ, সিরিঞ্জ, রক্ত সঞ্চালন, রক্তজাত ওষুধপত্র ব্যবহার ও শারীরিক মেলামেশার (যৌনসম্পর্ক) ফলে হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাস সংক্রমিত হয়ে থাকে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় সারা বিশ্বের প্রায় ৩০ কোটিরও বেশী লোক হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে আক্রান্ত। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮ থেকে ১০ ভাগ লোক হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে আক্রান্ত।

হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাসের সংক্রমণ ও জটিলতা অনেকটা 'বি' ভাইরাসের অনুরূপ। যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সারের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত। বাংলাদেশে অবশ্য হেপাটাইটিস 'সি' দ্বারা সংক্রমিত রোগ এখনো ব্যাপকভাবে সনাক্ত করার ব্যবস্থা নেই। কেবল ঢাকাস্থ সম্মিলিত সামরিক বাহিনী হাসপাতালের প্যাথলজী বিভাগে নিয়মিত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' সংক্রমণের হার প্রায় সমান। হেপাটাইটিস 'এফ' ও 'জি' সম্পর্কে এখনও বিজ্ঞান তেমন কিছু জানতে পারেনি। এ ব্যাপারে গবেষণা চলছে।

হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণসমূহ

হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হলেই জন্ডিস হবে এটা বলা যাবে না। হেপাটাইটিসের রোগীর শতকরা ৭৫ ভাগের জন্ডিস বা চোখ হলুদ হয় না। আমাদের দেশের বিপুলসংখ্যক রোগী সর্দি, কাশি ও জ্বরের মতই হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হয়ে সেরে ওঠেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংক্রমণ অজানা থেকে যায়। শুধু জন্ডিসের রোগীরা (চোখ হলুদ) চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। শতকরা ৬৫ ভাগ রোগী হাতুড়ে ডাক্তার, কবিরাজের শরণাপন্ন হন। তবে হেপাটাইটিস হলে সাধারণত: চোখ হলুদ বর্ণ ধারণ করে ও প্রস্রাবের রং হলুদ হয়। খাবারে অরুচি থাকে। শরীর দুর্বল থাকে। অনেকের আবার শরীর চুলকায়।

হেপাটাইটিসের চিকিৎসা ও পথ্য

জন্ডিস হলে চিকিৎসকের পরামর্শ বাঞ্ছনীয়। চিকিৎসক বুঝতে পারবেন জন্ডিস ভাইরাসজনিত না অন্য কোন কারণে হয়েছে। এসব রোগের চিকিৎসার জন্য গাছের পাতার নির্যাস, আখের রস সেবন বাঞ্ছনীয় নয়। এই চিকিৎসার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। আখের রসে অনেক সময় রোগীর মুখের রুচি একেবারেই নষ্ট করে দেয়। আমাদের দেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগীকে হলুদ-মরিচ ছাড়া তরকারি রান্না করে দেয়া হয়। হলুদ-মরিচ জন্ডিসের কোন ক্ষতি করে না। জন্ডিসের রোগীদের এমনিতেই খাবারের রুচি থাকে না। হলুদ-মরিচ ও সামান্য মসলা না দিলে খাবারে একেবারেই রুচি হয় না। যেসব রোগীর জন্ডিস ও ক্ষুধামন্দা বেড়েই চলে তাঁদের দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এক্ষেত্রে অবহেলা করলে সর্বনাশ ঘটতে পারে। মনে রাখতে হবে, জন্ডিসের রোগীর ক্রমাবনতি ক্ষুধামন্দা, পায়ে ও পেটে পানি আসা লিভার অকেজো হওয়ার লক্ষণ। এক্ষেত্রে রোগীকে সত্বর হাসপাতালে নিতে হবে। সাধারণত: পূর্ণ বিশ্রাম ও স্বাভাবিক আহার চালিয়ে গেলে এমনিতেই জন্ডিস ভাল হয়ে যায়। রোগীকে পরিশ্রম থেকে বিরত রাখতে হবে ও স্বাভাবিক খাবার দিতে হবে। যাঁদের খাবারের একেবারেই রুচি নেই এবং যাঁদের বমি হয় তাঁদেরকে হাসপাতালে ভর্তির পর চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে স্যালাইন দেয়া যেতে পারে। তবে শিরায় স্যালাইন দেয়ার বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেবেন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। গ্রামে-গঞ্জে হাতুড়ে ডাক্তারের মাধ্যমে শিরায় স্যালাইন নেয়া উচিত নয়। এতে মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

ভাইরাল হেপাটাইটিস : স্বাভাবিক খাবার ও পূর্ণ বিশ্রাম

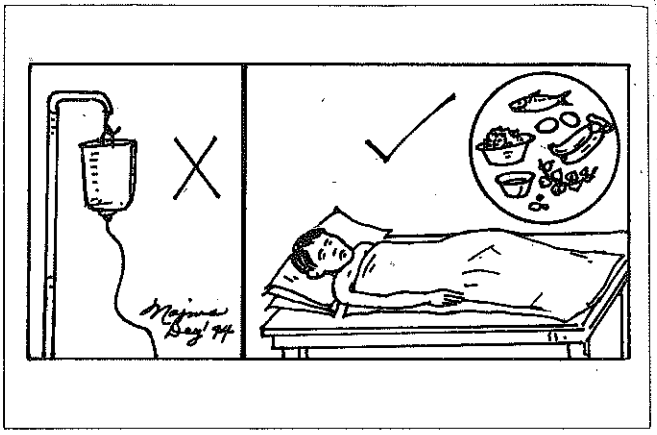

হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা

হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা নেই এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এ রোগের চিকিৎসার ওষুধ এখন বাংলাদেশেই পাওয়া যাচ্ছে। হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করা উচিত। 'বি' ভাইরাসে আক্রান্তদের শতকরা ৫০ ভাগ ওষুধ ব্যবহার করলে ভাল হয়ে যায়। তবে এ রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। প্রতি রোগীর ক্ষেত্রে ১ থেকে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হতে পারে। তবে 'বি' ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর ভ্যাকসিন এখন বাংলাদেশে নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে।

হেপাটাইটিস প্রতিরোধের উপায়

* হেপাটাইটিস ভাইরাসের টিকা নিতে হবে। বাংলাদেশে এখন শুধুমাত্র হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসের টিকা পাওয়া যায়।
* সকল ক্ষেত্রে ডিসপোজেবল ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে। একই ইনজেকশনের সুঁচ বারবার ব্যবহার করা মোটেই উচিত নয়। কেননা একই সুঁচ বারবার ব্যবহার করলে অন্য রোগীদের সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

* রক্ত সঞ্চালনের পূর্বে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে হবে।
* জীবাণুমুক্ত খাবার পানি বা পানি ফুটিয়ে পান করতে হবে।
* বাইরের উন্মুক্ত খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
* জ্বর, ক্ষুধামন্দা, বমি, বমিভাব, প্রস্রাবের রং হলুদ হওয়া হেপাটাইটিসের লক্ষণ। এ অবস্থা পরিলক্ষিত হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
* মাদকাসক্তি ও অবাধ মেলামেশা থেকে বিরত থাকতে হবে।
* জন্ডিস বা হেপাটাইটিসে আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী অন্য কেউ ব্যবহার করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।
* খাবার ও পান করার পানি যাতে মাছি দ্বারা সংক্রমিত হতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।
* ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে হবে ও স্বাস্থ্য সচেতন থাকতে হবে।

(নিবন্ধটি পিজি হাসপাতালের লিভার রোগ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মবিন খানের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে রচিত)

শুটকী মাছের বহু গুণ

মুজিবর রহমান, রেজাউর রহমান, আশিষ কুমার চৌধুরী
ও ডা: কে এম এস আজিজ

একটা পুরোনো প্রবাদ আছে "মাছে ভাতে বাংগালী"। এটি কিছুদিন আগেও বর্ণে বর্ণে সত্যি ছিল। অসংখ্য নদী, শাখা-নদী, পুকুর ও খাল-বিলে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন জাতের মাছ পাওয়া যেতো। মাছ ধরার মৌসুমে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাছ রোদে শুকিয়ে শুটকী করে যত্নের সাথে সংরক্ষণ করে রাখা হতো এবং অন্য সময়ে এগুলো খাওয়া হতো। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মৎস্য উৎপন্নকারী এলাকায় শুটকী মাছ একটি মজাদার খাদ্য হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু উচ্চবিত্তবান ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ একে কম-বেশী অপ্রয়োজনীয় খাদ্য হিসেবে উপেক্ষা করে থাকেন। যাঁরা শুটকী মাছের গুরুত্ব দেন না তাঁরা তাঁদের অজ্ঞানতার জন্যই এটা করে থাকেন। সত্যি বলতে গ্রামাঞ্চলে এই ঐতিহ্যবাহী খাদ্য ঘণীভূত আমিষ (প্রোটিন) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খনিজের যোগান দেয়।

আমিষ শরীরের গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ করে। আমিষ অন্যান্য শ্রেণীর পুষ্টি উপাদান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ এতে নাইট্রোজেন নামক উপাদান থাকে। পর্যাপ্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন সম্বলিত পুষ্টি গ্রহণের ফলে শরীরের মাংশপেশী ভালভাবে গঠনসহ সুঠাম ও সুস্বাস্থ্য গড়ে ওঠে। স্বাস্থ্যের মানদন্ডের দিক থেকে আমিষ উল্লেখযোগ্য উপকরণ, কারণ এটি এন্টিবডি তৈরীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ যা বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধক এবং ক্ষতস্থান দ্রুত সারাতে সহায়ক।

আমাদের দৈনিক খাদ্যে শতকরা ১২ থেকে ১৫ ভাগ আমিষ থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে একজন বয়স্ক লোকের খাদ্যে ৩০ থেকে ৪০ গ্রাম আমিষ থাকা উচিত এবং তার কিছু অংশ অবশ্যই প্রাণিজ খাদ্য থেকে হতে হবে। নিম্নে প্রাণিজ আমিষের প্রধান উপাদান বা উৎসগুলোর তালিকা দেয়া হোল।

আমিষের প্রধান উৎস
(প্রতি ১০০ গ্রাম)

	জলীয় অংশ (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)
ডিম (মুরগী)	৭৩	১৩.৩	১৩.৩	৬০
ডিম (হাঁস)	৭১	১৩.৫	১৩.৭	৭০
গরুর মাংস	৭৪	২২.৬	২.৬	১০
খাসীর মাংস	৭৪	২১.৪	৩.৬	১২
মুরগীর মাংস	৭২	২০.৯	০.৬	২৫
হাঁসের মাংস	৭২	২০.০	৪.৮	৪
টাটকা মাছ	৭০	১৮.০	৫.৬	৩৫০
শুটকী মাছ	১২	৬১.০	৭.৫	১৩৭১

শুটকী মাছ ঘণীভূত প্রাণিজ আমিষ জাতীয় পুষ্টি ও খনিজের অন্যতম প্রধান উৎস তা সেই শুটকী মাছ মিঠা পানিরই হোক আর সমুদ্রেরই হোক। সমুদ্রের মাছে একটি বাড়তি উপাদান 'আয়োডিন' রয়েছে যা গলগন্ড (ঘ্যাগ), বুদ্ধিহীনতা, মৃতবাচ্চা প্রসব প্রভৃতি আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। সমুদ্রের বা মিঠা পানির টাটকা মাছ সংরক্ষণ ও দূরাঞ্চলে সরবরাহ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সেদিক থেকে শুটকী মাছ সংরক্ষণ ও পরিবহনে অসুবিধা অনেক কম।

কলেরা গবেষণাগারে (আইসিডিডিআর,বি) পরীক্ষামূলকভাবে মিঠা পানি ও সমুদ্রের পানির শুটকী মাছের একটি তুলনামূলক পুষ্টিমানের গবেষণা পরিচালিত হয়। নিম্নে মিঠা পানি ও সমুদ্রের পানির শুটকী মাছের পুষ্টিমানের একটি তালিকা দেয়া হলো।

শুটকী মাছের পুষ্টিমান
(প্রতি ১০০ গ্রাম)

	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	ফসফরাস (মিলিগ্রাম)	জিঙ্ক (মিলিগ্রাম)	সোডিয়াম (মিলিগ্রাম)	পটাসিয়াম (মিলিগ্রাম)
(সামুদ্রিক মাছ)							
চেলা	৬০.২	১২.৩	১৫৭৭	১৪৯৬	৪.৪	৮০৫	২৯৫
মেকারেল	৬৮.৯	৭.৫	৮১৯	১১৩৩	৩.০	৮১৬	৪৫৮
রুপচাঁদা	৪৮.০	৬.৫	১৬০০	১০৪৩	১.৩	৪০৩৬	৮৩৭
লইট্টা	৬০.৫	৭.২	৮৮৫	৮৭০	১.৫	১৯৪৩	৬৬৩
(মিঠা পানির মাছ)							
রিঠা	৫৬.০	৫.০	১১০১	১১০৬	৬.২	১০৫৮	৩৫৭
গইনা	৬৪.৬	৬.৮	১৯৪৪	১২৬০	৮.৫	৪৪৮	৫০৬
কাঁচকী	৬৮.০	৯.৭	২১৬৬	১১২৫	৬.৭	৪২৫	৬৮২
শোল	৬৭.৫	৬.৪	৪৪০	৬৮০	৩.৪	৬৫৫	৫৯২

উপরোক্ত তালিকা অনুযায়ী সমুদ্রের ও মিঠা পানির শুটকী মাছে ঘণীভূত প্রাণিজ আমিষ ছাড়াও বিভিন্ন খনিজ উপাদান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। উভয় প্রকার শুটকীতেই প্রায় সমমানের পুষ্টি বিদ্যমান রয়েছে যা আমাদের দৈনন্দিন আমিষ ও খনিজ ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম। যাঁরা জন্য শুটকী মাছ পছন্দ করেন না তাঁরাও কিন্তু গন্ধ

বিমুক্ত করে শুটকী খেতে পারেন। আবার অনেকে সমুদ্রের টাটকা মাছ খান না। কিন্তু যাঁরা শুটকী খেতে ভালবাসেন তাঁদের জন্য সমুদ্রের মাছের শুটকী কোন সমস্যা নয়। আমেরিকাসহ বেশ কয়েকটি

পাশ্চাত্য দেশে শুটকী প্রথমে গুঁড়ো করে এবং এরপর গন্ধ বিমুক্ত করে বাজারজাত করা হয়। গন্ধহীন শুটকী সহজেই বিভিন্ন খাদ্যে ব্যবহার করা যায়।

বাংলাদেশে প্রচুর সামুদ্রিক মাছের শুটকী তৈরি করা হয়। এ থেকে কিছু অংশ গুঁড়ো ও গন্ধ বিমুক্ত করে বাজারজাত করা যেতে পারে। যাঁরা গন্ধযুক্ত শুটকী সহ্য করতে পারেন না তাঁদের জন্য গন্ধহীন গুঁড়ো শুটকী গ্রহণ করা সহজ।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বাংলাদেশে মাছই হচ্ছে প্রাণিজ আমিষ ও খনিজ পদার্থের উৎস যা সবাই সহজে পেতে পারেন। কিন্তু শুটকী মাছ উচ্চমানের খাদ্য হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি, কারণ ঘণীভূত পুষ্টিমানের সংবাদ ব্যাপকভাবে এখনো জনগণের কাছে পৌছায়নি।

বর্তমানে নদী, খাল-বিল, হাওর ও পুকুর ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে মাছের প্রাচুর্য মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ বিষয়ে গুরুত্বসহ দৃষ্টিপাত করার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। কেননা বাংলাদেশের গরীব জনগণের জন্য শুটকী মাছ প্রাণিজ আমিষ ও খনিজের প্রধান উৎস। তাই এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে জনগণের মধ্যে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মাছ চাষের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকা উচিত। সেই সাথে মাছ ধরার মৌসুমে অর্থাৎ যখন মাছ ধরা পড়ে, তখন অতিরিক্ত মাছ শুটকী করে মজুদ করা সম্ভব যা অন্য সময়ে খাওয়া যেতে পারে। এভাবে আমিষ জাতীয় পুষ্টির অভাব অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব।

পোলিও রোগ
চিকিৎসা ও প্রতিকার

সংলাপ রিপোর্ট

পোলিও একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। বাংলাদেশে প্রতিবছর এ রোগে ১০ হাজার শিশুকে পংগুত্ববরণ করতে হয়। শিশুকে সময়মত পোলিও ভ্যাকসিন না দিলে শিশু পোলিও রোগে আক্রান্ত হতে পারে। প্রতিরোধযোগ্য এ ব্যাধিটির বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সাল থেকে বাংলাদেশে সম্প্রসারিত টিকাদান কার্যক্রমের আওতায় পোলিও টিকা বা ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন প্রদান শুরু হয়েছে। শুধু পোলিও বা poliomyelitis রোগের বিরুদ্ধে নয়, ডিফথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, যক্ষ্মা ও হাম রোগের প্রতিষেধক একইভাবে দেয়া হচ্ছে। টিকাদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)-এর হিসেব মতে ১ বছরের কম বয়সী শিশুদের সম্পূর্ণ টিকাদানের হার শতকরা ৭৫ ভাগ। তবে ২ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ টিকাদানের এই হার শতকরা ৮০ ভাগ। পোলিও রোগ এখনও নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। অথচ এ রোগ সহজেই প্রতিরোধযোগ্য।

পোলিও রোগের কারণ

পোলিও রোগ সংক্রমণের একমাত্র কারণ হচ্ছে পোলিও ভাইরাস। খাদ্য ও পানির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, দূষিত পানি ও খাবার, শিশুর আংগুল ও দুধ (মায়ের দুধ ব্যতীত) ভাইরাস সংক্রমণের অন্যতম কারণ। এছাড়া আক্রান্ত শিশুর হাঁচি ও কাশির মাধ্যমেও এ রোগ ছড়াতে পারে। পোলিও ভাইরাস শরীরে প্রবেশের ৭ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে সাধারণতঃ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্য ক্ষেত্রে এ সময় ৩ থেকে ৩৫ দিন পর্যন্ত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ

পোলিও রোগের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কোন লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই শিশুটির পংগুত্ব নির্ধারিত হয়ে যায়। তবে প্রাথমিক অবস্থায় জ্বর, শরীরে ব্যথা এবং ঘাড় শক্ত হতে পারে। এ অবস্থা কয়েকদিন চলার পর রোগীর হাত বা পা অথবা হাত-পা উভয়ই অবশ হয়ে আসে। রোগী পংগু হয়, রোগীর এক হাত বা এক পা অথবা ঘাড় অবশ (paralyzed) হয়ে যায়।

রোগের চিকিৎসা

পোলিও রোগের কোন চিকিৎসা নেই। তবে এই রোগের চিকিৎসায় গরম সেঁক, ফিজিওথেরাপি এবং শারীরিক ব্যায়াম করার পরামর্শ দেয়া হয়।

রোগের প্রতিরোধ

পোলিও রোগের বিরুদ্ধে এখন টিকা পাওয়া যায়। সরকারের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি গ্রামে টিকা পাওয়া যাচ্ছে। শিশুর দেড়মাস বয়স থেকে ১ বছরের মধ্যে অন্যান্য টিকাদানের সময়, বিশেষ করে ডিপিটি দেয়ার সময়, ১ ডোজ করে ১ মাস অন্তর অন্তর ৩ ডোজ ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন শিশুকে খাওয়াতে হবে।

তাহলে আর পোলিও রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই আমাদের সবার উচিত সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর সুযোগ নিয়ে দেশ থেকে পোলিও রোগ নির্মূল করা।

স্বাস্থ্য কুইজ-৯

১. যেকোন ধরনের নলকূপ থেকে কাঁচা ল্যাট্রিনের দূরত্ব কত হওয়া উচিত?

২. 'ল্যাথারিজম' রোগের জন্য খেসারী ডালের যে বিশেষ উপাদানটি দায়ী তার নাম কি?

৩. গর্ভকালীন সময়ে সাধারণত: কতটুকু ওজন বৃদ্ধি পায়?

৪. কোন শিশু পুন: পুন: গলাব্যথায় আক্রান্ত হলে কোন্ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে?

৫. একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের শরীরে মোট কতটুকু আয়রন থাকে?

উত্তর পাঠাবার নিয়ম ঃ

১. সাদা কাগজে উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে পাঠাবেন।

২. আই.সি.ডি.ডি.আর,বি-এর কোন কর্মচারী বা তাঁদের পরিবারের সদস্যবর্গ এই প্রতিযোগিতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৩. এ পত্রিকার বিচারকমন্ডলীর রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

৪. সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতাকে পুরস্কার পাবার যোগ্য বলে ধরা হবে।

৫. তিনজন সঠিক উত্তরদাতাকে পুরস্কৃত করা হবে। সঠিক উত্তরদাতার সংখ্যা তিনজনের বেশী হলে লটারীর ভিত্তিতে তিনজনকে বাছাই করা হবে।

৬. প্রত্যেক বিজয়ীর পুরস্কারের মান ১০০ টাকার প্রাইজবন্ড।

৭. খামের ওপর "স্বাস্থ্য কুইজ-৯" কথাটি লিখবেন। উত্তর পাঠাবার ঠিকানা ঃ সম্পাদক, স্বাস্থ্য সংলাপ, আই.সি.ডি.ডি.আর.,বি, জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০।

৮. উত্তর অবশ্যই ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছতে হবে।

স্বাস্থ্য কুইজ-৮-এর উত্তর

১. এই মহিলাকে ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী হিসেবে চিহ্নিত করব, কারণ এই মহিলার পূর্ববর্তী গর্ভ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এখন পর্যন্ত কোন সমস্যা দেখা না দিলেও যেকোন মুহূর্তে তা দেখা দিতে পারে। তাই তাকে বিশেষভাবে যত্ন দেয়ার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

২. নবজাতক মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময়ে হাম রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা পেয়ে থাকে। মা থেকে যে প্রতিরোধ ক্ষমতা পায় তা শিশুর শরীরে ৯ মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকে। তাই নয় মাসের মধ্যে শিশু হামে আক্রান্ত হয় না।

৩. আমাদের দেশের শিশুরা রোটাভাইরাল ডায়রিয়ায় বেশী আক্রান্ত হয়। পরিমাণ মত খাবার স্যালাইন এবং শিশুর অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার খাওয়াতে হবে।

৪. একজন মহিলার কোলের সন্তানের বয়স ৬ মাসের কম হলে, স্বাভাবিক মাসিক শুরু না হয়ে থাকলে, শিশুটি চার ঘন্টা অন্তর অন্তর তার বুকের দুধ খেলে এবং শিশুটি সম্পূর্ণভাবে তার বুকের দুধের উপর নির্ভরশীল হলে তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতি ব্যবহার ছাড়াও জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

৫. বর্তমানে জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ি ও ইনজেকশন ব্যবহারে কোন নিষেধ না থাকলে একজন মহিলা 'মেনোপজ' না হওয়া পর্যন্ত এগুলো ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ একজন মহিলার মাসিক চিরতরে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত খাবার বড়ি ও ইনজেকশন ব্যবহার করতে পারে। শুধু ব্যবহারে কোন বাধা-নিষেধ থাকলেই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করতে পারবে না। এগুলো আর এখন বয়সের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু ধুমপায়ী মহিলার বয়স ৪০ এর উর্ধ্বে হলে খাবার বড়ি ব্যবহার করতে পারেন না।

গতবারের স্বাস্থ্য কুইজের সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারেননি

আপনার শিশুকে পোলিও'র টিকা দিয়ে পঙ্গুত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা করুন

জেনে রাখা ভাল

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে কি করবেন?

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া বা electric shock বাংলাদেশের একটি নৈমিত্তিক দুর্ঘটনা। বাড়িতে, অফিসে ও কল-কারখানায় যেকোন সময় যেকেউ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার মত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টতাজনিত মৃত্যুর ঘটনাও কম নয়। সংযোগকৃত বিদ্যুৎ এর তার অথবা অনেক ক্ষেত্রে বাড়িতে সুইচ বিদ্যুতায়িত হওয়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। এমতাবস্থায় তাৎক্ষণিক কিছু ব্যবস্থা নিতে পারলে প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে যা করণীয়

* বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার সাথে সাথে ঘরের বা দুর্ঘটনাস্থলের বিদ্যুতের মূল সংযোগ লাইন/প্রধান সুইচ বন্ধ করতে হবে।
* বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে তড়িতাহত ব্যক্তিকে ধরবেন না। এতে আপনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে পারেন।
* আহত ব্যক্তিকে ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে তার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক আছে কিনা। প্রয়োজনে মুখে মুখ রেখে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। (স্বাস্থ্য সংলাপ-এর বর্ষ ২, সংখ্যা ১, বৈশাখ ১৪০০-এ বিস্তারিত দেখুন)।
* আহত ব্যক্তির শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে কিনা বা শরীরের কোন হাড় ভেংগেছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।
* বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার কারণে শরীরের কোন স্থান পুড়ে গেলে পুড়ে যাওয়া স্থানে ঠান্ডা পানি ঢালতে হবে।
* মনে রাখতে হবে, বেশির ভাগ বিদ্যুৎস্পৃষ্টতাজনিত দুর্ঘটনা (electric injuries) বাড়িতেই ঘটে থাকে। বাড়ির বা বাসার বিদ্যুৎ লাইন বা সংযোগ (electric wiring) ত্রুটিমুক্ত রাখতে হবে।
* যদি দুর্ঘটনাস্থলের বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব না হয় তবে বিদ্যুৎ-অপরিবাহী কোন বস্তু যেমন : শুকনা কাঠ বা বাঁশ দিয়ে অথবা হাতের কাছে কোন কাঠের চেয়ার থাকলে তা দিয়ে বিদ্যুৎসঞ্চারিত তারটি আলাদা করতে হবে।
* মনে রাখতে হবে, অনেক সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার সংগে সংগে আহত ব্যক্তি ছিটকে পড়তে পারেন। এতে হাত-পা ভেংগে যাওয়াসহ মাথায় আঘাত লাগতে পারে। আবার শরীরের কোন কোন অংশ বিদ্যুৎস্পৃষ্টতাজনিত কারণে পুড়ে যেতে পারে। আহত ব্যক্তির ক্ষতস্থান শুকনা কাপড় দিয়ে 'ড্রেসিং' করা যেতে পারে। অল্প পুড়ে গেলে ক্ষতস্থানে 'পরিষ্কার কাপড়' লাগিয়ে ঠান্ডা পানি ঢালা উপকারী।
* লক্ষ্য রাখতে হবে, আহত ব্যক্তি যাতে দুঃসহ অবস্থায় না পড়ে তার জন্য যথাসম্ভব কম লোকজন ঘরে থাকা উচিত এবং ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিতে হবে। দ্রুত রোগীকে হাসপাতালে নিতে হবে।

সতর্কতা

* ভিজা হাত দিয়ে কখনও বিদ্যুতের সুইচ ধরবেন না। এতে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কখনও শিশুদেরকে বিদ্যুতের তার ধরতে বা সুইচ অফ/অন করতে দিবেন না।
* মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ সংযোগ, সুইচ ও তার পরীক্ষা করা দরকার। প্রয়োজনে পুরানো তার পরিবর্তন করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য ছোটখাট ত্রুটি সারিয়ে ফেলতে হবে।
* বাসায় ব্যবহৃত বিদ্যুৎ-সংযোগ থেকে হিটার ব্যবহার করবেন না।
* দুর্ঘটনাবশত: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে কি করণীয় তা বাসার সবাইকে শেখাতে হবে।

দুর্ঘটনা এড়াতে ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক তার/সুইচ এখনি সারিয়ে ফেলুন

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে; **সম্পাদক ঃ** ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ** এম. শামসুল ইসলাম খান; **কনসালটেন্ট এডিটর ঃ** ডাঃ মোড়ল নজরুল ইসলাম; **সদস্য ঃ** ইউসুফ হাসান, ডাঃ কামরুন নাহার, মুজিবুর রহমান ও ডাঃ তানজিনা মির্জা; **সার্কুলেশন ম্যানেজার ঃ** হাসান শরীফ আহমেদ; **ডিজাইন ঃ** আসেম আনসারী

প্রকাশক ঃ আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আই.সি.ডি.ডি.আর.,বি), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০

ফোন ঃ ৬০০১৭১-৮; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬; টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আই.সি.ডি.ডি. বি.জে

মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা বাংলাদেশ